এক নতুন সমাজের সন্ধানে
(গান্ধী রাজের কথা)

- অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

মহাত্মা গান্ধী তাঁর ইপ্সিত সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে রামরাজ্যের কথা বলেছেন। এটি প্রতীকী, নিশ্চয়ই রামায়ণের রামচন্দ্র নয়। তবে রাজণ্ কথাটি যদি 'রঞ্জয়তি' থেকে সৃষ্ট হয় তবে প্রজানুরঞ্জণের ক্ষেত্রে রামচন্দ্র নিশ্চয়ই আদর্শ স্বরূপ এবং স্বার্থ-সর্ব্বস্বের যুগে তা অবশ্যই অনুকরণীয়। গান্ধীজী আসলে রামরাজ্য বলতে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন - যেখানে আসাম্য, বঞ্চনা, অন্যায় ও শোষণ নেই।

শারিরিকভাবে গান্ধীজী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবে মিলিত এক মৌলিক সমাজ দর্শন তিনি আমদের জন্যে রেখে গেছেন যা বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। একে গান্ধী-রাজ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রচলিত দর্শনের আলোয় মহাত্মা গান্ধী মুখ্যত ছিলেন পরার্থবাদিন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাঁর জীবন ছিল অন্যের দুঃখ মোচনের জন্যে আন্দোলনের এক গাথা। কিন্তু প্রকৃত ও সর্ব্ব অর্থে স্বাধীনতা বা মুক্তিই ছিল তাঁর সকল প্রচেষ্টার মুখ্য প্রেরণা - তা কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্ম ও নীতির ক্ষেত্রেও। অবশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা মুখ্যত তাঁকে আবদ্ধ করে ফেলেছিল কারণ বিদেশী শাসন তাঁর মুক্ত সমাজ বা স্বরাজ বা সত্যসমাজ স্থাপনে অন্তরায় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম্মে তাঁর ধ্যানের মুক্তির আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন ও আমাদের প্রকৃষ্ট পথও দেখিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি প্রচেষ্টায় রত হননি, সকলে যাতে পূর্ণ মুক্তি বা সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় তাই ছিল তাঁর কামনা - গুরুদেবের ভাষায় 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'.....। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরও একটি কবিতা 'বৈরাগ্য'-তে লিখছেন যে দেবতা আমাদের এই সংসারেই আছেন, তাঁকে পাবার জন্য সংসার ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য, তাঁরা সংসারে থেকেই মুক্ত পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন।

প্রত্যেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চিন্তা-ভাবনা, কার্যক্রম ও কার্যধারার মধ্যে তাঁর সময়ের বিভিন্ন শক্তির বিন্যাস যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাঁর সমাজ-দর্শনের মধ্যে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। অর্থাৎ দর্শন ও দার্শনিক একাঙ্গীভুত হয়ে অভীপ্সাকে পূর্ণ করে। এই দর্শন বহুমাত্রিকও হতে পারে। গান্ধী-ব্যক্তিত্ব ও দর্শনও সেইভাবে বিভিন্ন শক্তি ও বিষয়ের ওপর আধারিত বা গান্ধীজী এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সমাজ-ভাবনায় তা পূর্নমাত্রায় প্রকাশিত।

এই বিষয়গুলির মধ্যে তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সঠিক বিশ্লেষণ হয়ত ইঙ্গিত করতে পারে কি ধরণের সমাজ গান্ধীজী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

যে বিষয়গুলি মুখ্যতঃ গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলি হল সত্য, স্বারজ ও অহিংসা। এগুলি একের বেশী ঠিকই, কিন্তু তারা একটি মূল বিষয়ের অংশবিশেষ অর্থাৎ অহিংসা এবং পুনর্গঠিত সমাজ বা নব সমাজ বা গান্ধীরাজের মূল চালিকা শক্তি এটিই।

মহাত্মাজীর মূল লক্ষ্য ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা - তাঁর সমাজকে সত্যসমাজও বলা হয়। তিনি ঈশ্বরই সত্য বলে শুরু করে সত্যই ঈশ্বর বলে পরবর্ত্তী পর্যায়ে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর সত্য সমাজের বাস্তব

পরিস্থিতিও - তিনি দেখেছেন গরীবের কাছে অন্নই সত্য - যেখানে সবাই জীবনধারণের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী পায়না তা তাঁর কাছে অসত্য সমাজ। কাজেই কেবল নৈতিক দিকটিই নয়, সমাজের বস্তুগত পরিকাঠামোকেও এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে সকলের জন্যে কাজ নিশ্চিত করা যাবে। অর্থাৎ যেখানে সকলেই জীবনধারণের জন্যে ন্যূনতম সামগ্রী পাবে না তা অনৈতিক সমাজ।সেখানে মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলেও গান্ধীজী মনে করতেন। সেইজন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ ভোগ-সামগ্রীর (কন্‌স্‌মাসান্‌ বাস্কেট্‌) কথা তিনি বলেছিলেন যা আজও পৃথিবীর কোন দেশ তার সব নাগরিকদের মধ্যে নিশ্চিত করতে পারেনি। কাজেই গান্ধীজী উচ্চমানের জীবনধারণের বিরোধী ছিলেন তা বললে ভুল হবে। কেবল সকলের জন্যেই তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই জন্যে তাঁর সমাজদর্শন বিশ্লেষণ করলে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মূলত চারটি নীতির ওপর ভিত্তি করে তা গঠিত হয়েছে -
(১) যিনি বা যাঁরা যে পর্যায়েই থাকুন - গ্রামেই থাকুন বা শহরেই থাকুন - করো জীবনধারণের মান এমন হবে না যা অন্যদের জন্যে নিশ্চিত করা যাবে না। তাঁর বিরল অন্তর দৃষ্টি দিয়ে গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী সম্পদ বন্টনের একটি বিশেষ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করতে না পারলে বেশীরভাগ দেশই বঞ্চনার শিকার হবে। সেইজন্যে সম্পদের কেবল সমবন্টনই নয়, প্রত্যেকের জন্যে ন্যুনতম সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) জীবনধারণের সামগ্রী সকলের জন্যে একই প্রকার হবে - কারও পদমর্যাদা, কাজ বা ক্ষমতার অধিকার এই বিষয়ে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারবে না। অর্থাৎ সকলেই সচেতনভাবে তাদের প্রয়োজনটুকুই নেবেন, তার অতিরিক্ত নয়।

(৩) পৃথিবীর সম্পদ এমন পর্যায়ে নেই যে সকলের জন্যেই উচ্চমানের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা যাবে। তা যদি চেষ্টা করা হয় তবে মনুষ্য সমাজের কাছে দুটি বিকল্প থাকবে - কিছু মানুষ উচ্চ জীবনমানের অধিকারী হবে, বাকী সবাই দারিদ্রে বসবাস করবে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ছবিটাই ত আমরা দেখছি এবং বঞ্চনা অনেক সময়েই সন্ত্রাসের জন্ম দিচ্ছে।

(৪) গান্ধীজী সেইজন্যে 'এলিটিস্ট' বা অভিজাত ব্যবস্থাকেই ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন এবং যারা ইতিমধ্যেই ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের স্বেচ্ছা-সংযমের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর অছিবাদের মাধ্যমে। তাঁদের প্রয়োজনারিক্ত সম্পদ ও ক্ষমতা ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। (চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ভারতীয় দৃষ্টিতে 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে আত্ম-সংযমই প্রকৃত সংস্কৃতি, যাকে গান্ধীজী বলেছেন স্বশাসন)। অন্যথায় লুই ফিশারকে গান্ধীজী বলেছিলেন যে স্বাধীন ভারতে বঞ্চিত ও শোষিতদের নিয়ে তিনি এমন আন্দোলন করবেন যে সুবিধাভোগীরা পালিয়ে বাঁচবে।

সত্যকে পাওয়া ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সমাজের বস্তুগত পরিকাঠামোর অন্তর্গঠন ও ন্যায় এবং মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা 'স্বরাজ' লাভের অভিন্ন কার্যক্রম। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখছেন - "আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে" - অর্থাৎ স্বরাজ-সমাজে সকলেই সমান - রাজা নেই, ক্ষমতার ব্যবসায়ীরা নেই, আধিপত্য নেই এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বশাসন ও স্বনির্ভরতাই মুখ্য। রাষ্ট্র কাঠামো কেন্দ্রীভূত, ক্রমোচ্চ বা পিরামিডের মত নয়, স্বশাসিত, স্বনির্ভর ছোট ছোট জনপদে (প্রজাতন্ত্র) বিস্তারিত এবং সেইজন্যে মানুষে মানুষে বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক ও আদান-প্রদান পারস্পরিক ও সমান - সমান, কোন প্রকার বিভেদের সুযোগ নেই। গান্ধী-রাজ কেবল অহিংসার ওপরেই আধারিত। আমরা জানি গান্ধীজীর কাছে হিংসার অর্থ ছিল শোষণ,

কেন্দ্রীকরণ ও আধিপত্য। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণ ওতঃপ্রোতভাবে উপস্থিত এবং গরীব ও দুর্ব্বলই মুখ্যতঃ আক্রান্ত। সেইজন্যে স্বরাজ সমাজে গরীব ও দুর্ব্বল জনগণই প্রকৃত ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হবে।

অনেকেই মনে করেন যে গান্ধীজী বৃহৎ শিল্প, সংসদীয় গণতন্ত্র, জটিল প্রযুক্তি ও পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন আবিষ্কারের বিরোধী ছিলেন। এটি মারাত্মক ভুল। গান্ধীজী চেয়েছিলেন গরিবীর অবসান এবং যদি বৃহৎ শিল্প ও সংসদীয় গণতন্ত্র শোষণহীন এক সমাজ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতো তাহলে তিনি তাদের নিশ্চয়ই স্বাগত জানাতেন। কিন্তু একটি নতুন শোষনহীন সমাজ - পরিকাঠামোর খোঁজ করতে গিয়ে গান্ধীজী বুঝতে পেরেছেলেন যে এর জন্যে নতুন ধরণের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং সেইজন্যে পারস্পরিক সমপর্ক, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যরকম হতেই হবে। গান্ধী অনভিপ্রীত এই শোষক সমাজের পরিবর্তন অহেতুক দ্রুত না হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে সংঘটিত করতে হবে এইটিই মহাত্মাজী ধেবেছিলেন। মার্কসের মতো তিনি মনে করেননি যে অর্থনৈতিক নির্দ্দেশ্যবাদই সমাজ বিকাশের অন্যতম নীতি। তাঁর মতে এই বিষয়ে মূল ভিত্তি হল বিকেন্দ্রীকরণ। সেইজন্যে নীতি নির্ধারণ ও উৎপাদন এমনভাবে সংঘটিত হবে যাতে কোনপ্রকারই কেন্দ্রীকরণ সুযোগ না পায় এবং সেই সব দ্রব্যই উৎপাদিত হবে যা আমাদের প্রাথমিক চাহিদাকে পূরণ করবে ও বন্টন ও ব্যবহার স্থানীয়ভাবেই হবে। বিলাসদ্রব্য উৎপাদন নিশ্চয়ই হবে তবে তা সকলের জন্যে এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থার পরে। বৃহৎ শিল্পও হবে, তবে মালিকানা জনগণের হাতেই থাকবে যাতে উদ্বিত্ত সম্পদ পুনর্ব্যবহৃত হয়, হিংসা সৃষ্টি না হয়। সহযোগী, সমবায় নীতির ওপর আধারিত নতুন সমাজের রাষ্ট্রকাঠামো এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই সুনিশ্চিত করবে যেখানে সকলেই নীতি-নির্ধারক, কেউই বহিরাগত নয়। কাজেই সুখ-দুঃখের অংশীদারত্বে জীবন এই নতুন সমাজে সৃষ্টময়, গতিময়, আনন্দময় হবে।

গান্ধীরাজ কি অবাস্তব, কল্পনা-বিলাস! কিন্তু কবির ধারণায় কি নেই - "আপনারে লয়ে বিব্রত হতে - আসেনাই কেহ ধরণী পরে - সকলের তরে সকলে আমরা - প্রত্যেকে মোরা পরের তরে"। যজ্ঞ শুরু হোক না, চড়ইবেতি তো মানব-লক্ষণ। সারা বিশ্ব জুড়ে বর্তমানে যে ধাঁচের 'বিশ্বায়ন' অনুষ্ঠিত হচ্ছে, একটি বিশেষ উগ্র সংস্কৃতির প্রচার ও প্রয়োগ চলছে, মানুষের সঠিক, সুস্থ পরিচয় যেখানে রাহুগ্রস্থ, বঞ্চনা থেকে হিংসা, শোষণ থেকে দুর্বিত্তায়ন যেখানে প্রতিষ্ঠিত সত্য, সেই সমাজ অভিস্পীত কিনা তার পরীক্ষার দিন আজ উপনীত। সেক্ষেত্রে গান্ধী মত ও পথ সম্বন্ধে আলোচনা স্বাভাবিক। তবে তাকে চর্যার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করতে হবে। এটিই সঠিক গান্ধী।